ভারতীয় রাজনীতি ও জাতপাত

ড. দেবাশিস নন্দী

ভারতীয় রাজনীতি স্বাধীনতার পর থেকে যে সকল বিষয় নিয়ে ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করেছে "জাতপাত" তাদের মধ্যে অন্যতম। জাতপাতের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতি যেমন বহুধা বিভক্ত, তেমনি জোট-রাজনীতি ব্যবস্থার উদ্ভবের অন্যতম কারণ হিসাবে জাতভিত্তিক রাজনীতিকে দায়ী করাই যেতে পারে। যদিও জাতপ্রথা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তথাপিও এটি কেবল হিন্দু সমাজের পক্ষেই প্রযুক্ত। হিন্দু সমাজের "জাত ব্যবস্থা" এক প্রভাবশালী সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ছিল, এটি এখন সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে এবং আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি করার পাশাপাশি রাজনীতির গাণিতিক হিসেবকে করে তুলেছে আরও জটিল। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস তাঁর *"Caste in Modern India"* গ্রন্থে ভারতের জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, "জাত ব্যবস্থাকে সকলে এত নীরবে ও পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করেছে এমন কী যারা এ ব্যবস্থার নিন্দায় পঞ্চমুখ তারাও জাত ব্যবস্থাকে সর্বত্র সামাজিক ক্রিয়াকলাপের একটি মানদণ্ডে পরিণত করেছেন। প্রাচীন ভারতে জাতগত পরিচিতির ওপর নির্ধারিত ছিল মানুষের সামাজিক অবস্থান। ভারতীয় সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের ক্ষেত্রে জাতি ব্যবস্থা নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ।"

জাতের ধারণা ও অর্থ ঃ

জাত ব্যবস্থাভিত্তিক সামাজিক মর্যাদার স্তরবিন্যাস প্রাচীন ভারতে ছিল। অধ্যাপক শ্রীনিবাস জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, "সর্বভারতীয় কাঠামোয় জাত হল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সারিবদ্ধ স্থানীয় ব্যবস্থা, যা বর্ণের (তথাকথিত চারটি মূল জাতের পরিপ্রেক্ষিতে) ধারণার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে।" এ অর্থে জাত ব্যবস্থা বলতে চারটি বর্ণের পরিবর্তে শত শত স্বতন্ত্র ও স্থানীয় জাত বোঝায়—যে জাত ব্যবস্থা সূক্ষ্মভাবে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেছে এবং সাম্প্রতিককালে রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে (হিমাংশু ঘোষ অনূদিত, ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা)। অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভারতীয় জাত ব্যবস্থার কয়েকটি চারিত্রিক দিক উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস, সগোত্র বিবাহ ও সমান বা উচ্চ জাতিগত বিবাহ, পেশাগত সংগঠন, খাদ্য, পানীয় ও ধূমপানের উপর নিয়ন্ত্রণবিধি, পোশাক, প্রথা ও কথার পার্থক্য, ছুৎ-অচ্ছুৎ, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। জাতির ইংরেজি প্রতিশব্দ caste, যা স্প্যানিশ শব্দ casta থেকে এসেছে। এর অর্থ কুল বা জাতি। জাতি গড়ে উঠেছে অন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে। জাতের ধারণা পেশা বা বৃত্তির নিরিখে গড়ে উঠেছে। একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, আচার-রীতিতে সাদৃশ্য থাকে—একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে। চারটি স্তরে বিভক্ত ভারতের জাত ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পেশার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, উচ্চ জাতভুক্ত জনগোষ্ঠী সম্মানজনক কাজ করত। শূদ্র ছিল অস্পৃশ্য ও সেবাকারী, অনুগত, অবহেলিত। প্রথম থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জাত ব্যবস্থা ভারতে টিকে আছে। সামাজিক ক্ষমতাগত কাঠামোতে উচ্চবর্গের জাতের লোকরা প্রথম সারিতে ছিল এবং এরা শূদ্র শোষণ করত। প্রাক্-স্বাধীন ভারতে এটাই ছিল সাধারণ চিত্র। জাতিভিত্তিক পদবি নির্ধারিত হয়েছে ভারতে। জাত ব্যবস্থায় সামাজিক সচলতার অভাব রয়েছে। এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের সামাজিক সম্পর্ক

Scanned with CamScanner

স্থাপন কিংবা নিম্নজাত থেকে উচ্চজাতে উত্তরণ এর বিষয়টি অবরুদ্ধ ভারতীয় সমাজে। জীবনধারাগত পার্থক্য, জাতিগত বিধিবিধানের বৈসাদৃশ্যতা প্রতিটি জাততে পৃথক সত্ত্বা দিয়েছে।

সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। ১৯৪৭ সাল, শুরু হল গণতান্ত্রিক, আধুনিক, পাশ্চাত্য শিক্ষা সমৃদ্ধ নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে বৃদ্ধি পেল সচেতনতা। সনাতন সামাজিক স্তরবিন্যাস, তথা জাতি ব্যবস্থা ও প্রভাবিত হল পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সাম্যের অধিকার স্থান পেয়ে সেখানে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করা হল। সংবিধানের প্রস্তাবনায় গুরুত্ব পেল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলি। মৌলিক অধিকারগুলোতে জাতি, বর্ণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যাতে বৈষম্য না ঘটে সে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হল। সংবিধানে উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতির মধ্য দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংকীর্ণতা দূর করার চেষ্টা করা হল; তাতে সাবেকী জাতিভিত্তিক সংকীর্ণ মানসিকতাকে কিছুটা পরিমাণে ভাবালেও সম্পূর্ণভাবে সফল হল না। মরিস্ জোন্স-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ "The Central discovery is that politics is more important to castes and castes are more important in politics than ever before". স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে জাতিব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী বিভেদমূলক শক্তি হয়ে ওঠে রাজনীতির ক্ষেত্রে।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর, **গণতন্ত্র ধর্ম ও রাজনীতি** নামক গ্রন্থে বলেন, শুঙ্গাযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে গঠিত তৎকালীন শ্রেণির মধ্যে এক নিবিড় সমঝোতা গড়ে উঠেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বিপুল সংখ্যক শূদ্রের ওপর যৌথভাবে শোষণ ও শাসন কায়েম করা। এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক শ্রেণি সমঝোতার মাধ্যমেই জাতিবর্ণ ভেদভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব এ দেশের সাধারণ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যাইহোক, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যকার সমঝোতার মাধ্যমেই প্রাচীন ভারতে এক শক্তিশালী শাসকশ্রেণি গড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করেন কৃষক শ্রেণি—প্রথম পর্যায়ে বৈশ্যরূপে গণ্য হলেও ধর্মশাস্ত্রের যুগে তাদের অধিকাংশই শূদ্রে পরিণত হয়েছিল। ক্ষুদ্র চাষি ও ভূমিহীন কৃষকেরা যেমন শূদ্রে পরিণত হতে শুরু করেছিল, তেমনি ধনী ব্যবসায়ী, বড়ো ভূস্বামী, স্বর্ণ ও মণিমুক্তোর কারবারিরা বৈশ্যে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে শূদ্র থেকে আবার অস্পৃশ্য বা অতিশূদ্রের জন্ম হয়েছিল। শূদ্রেরাই বর্তমান কালের অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি-উপজাতি। এদের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার $\frac{৩}{৪}$ অংশ।

স্বাধীনতার পর জাতপাত ব্যবস্থা তার সামাজিক ভূমিকা হারিয়েছে ঠিকই কিন্তু রাজনীতিতে এর প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ একসময় ভারতের জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন, "জাতই হল ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল"। ভারতীয় রাজনীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্নজাতের ভোটারদের সচেতনতা ও কার্যকলাপ বৃদ্ধি এবং নিজস্ব স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এর ফলে অনেক এলাকাতেই রাজনীতির ভারসাম্যের তারতম্য ঘটেছে।

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস জাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Caste is a heredity, usually localised group, having a traditional association with ~~an occupational~~ and a particular position in the local hierachy of castes." আন্দ্রে বেঁতে ভারতের জাত ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, জাত ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তিনদিক দিয়ে। যেমন—**প্রথমত,** প্রতিটি জাতের নেতৃবর্গ জাতগত স্বার্থরক্ষার স্লোগান দিয়ে নিজ জাতের জনগণকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে এবং সেই সমর্থনের জোরে নির্বাচনে জয় লাভ করতে পারে। যেমন—বেনে বা বণিক সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়কে ভোট দিতে পারে। নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত করার জন্য জাতগত বিবেচনা করা হয় প্রার্থী বাছাই এর ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের আগে ও পরে ব্যক্তি

Scanned with CamScanner

বনাম ব্যক্তির যোগাযোগ স্থাপন ও নেটওয়ার্ক তৈরির মধ্য দিয়ে জাতভিত্তিক লাইনকে সামনে রেখে জনসমর্থন তৈরি করা যায়। আন্তঃজাতভিত্তিক সম্পর্ক খুব জরুরি এখানে এলিটবাদী ভাবনা বর্জনীয়। তৃতীয়ত, জাতভিত্তিক সংগঠন খুব প্রয়োজন। বিশেষ করে, নিজস্ব জাতের স্বার্থকে সমন্বিত করার জন্য। যেমন—তামিলনাড়ুতে গড়ে উঠেছে "Vanniyakkula Kshatriya Sangam"—জাতভিত্তিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের জাত-ব্যবস্থা ঃ

জাতপাতভিত্তিক পর্যালোচনায় অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস-এর সংস্কৃতিকরণ (Sanskritization) ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, " 'সংস্কৃতিকরণ' হল সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার দ্বারা নিম্নজাতি অথবা উপজাতি অথবা অন্যান্য গোষ্ঠী যখন উচ্চ জাতির, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, আদর্শ এবং জীবনধারা গ্রহণ করে।" এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঁচু জাতির সংস্কৃতিকে নীচু জাতি গ্রহণ করার চেষ্টা করে নিজেদের উন্নীত করতে চায়। স্বাধীনতার পর শিক্ষা-সচেতনতার প্রভাবে নীচু জাতি রাজনীতি বিষয়ে অধিকার আদায়ের চেষ্টা শুরু করতে থাকে। ভারতে জাতব্যবস্থা রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং অপরটি হল জাতব্যবস্থা রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক করে তুলেছে। *"Politics in India"* গ্রন্থে অধ্যাপক রজনী কোঠারি বলেন, "জাতপাতের ব্যবস্থা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে না বরং জাতপাতের ব্যবস্থাই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।" রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন জাতব্যবস্থা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে নতুন পথে কার্যকর হয় তখন আধুনিকীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

অধ্যাপক রজনী কোঠারি মনে করেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন জগতে বহু উপাদানের মধ্যে জাতব্যবস্থা হল এমন একটি বিষয় যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং জাতব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য বহু নির্ণায়কের মতো শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কে পরিণত হয়েছে।"

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকেই জনসাধারণের কাছে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা এসেছে, তেমনি জাতপাতভিত্তিক নির্বাচনী সমীকরণও নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ভারতের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য জাতভিত্তিক প্রচার ও জাতভিত্তিক দলীয় রাজনীতির দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়েছে। *Asian Drama*-তে গার্নার মিরডাল এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমানে জাতিব্যবস্থা অধিকতর শক্তি অর্জন করেছে।" সামাজিক শক্তি হিসেবে জাতব্যবস্থার প্রভাব কমলেও রাজনীতির নতুন শক্তি হিসেবে এর আবির্ভাবই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতৃবর্গ প্রথম হতেই কিছু উচ্চবর্ণের এলিট হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে উঠে এসেছিল। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অধিকাংশ অঞ্চলে, কায়স্থরা উত্তর ভারতে, বেনেরা অনেক অঞ্চলের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করত। উঁচু এবং নীচু জাতের মাঝখানে বহু সংখ্যক কৃষি এবং শ্রমভিত্তিক জাতের অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে ছিল। এ ছাড়াও দলিত সম্প্রদায়, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতি সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনীতি ও জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে জওহরলাল নেহরুর সময়কাল থেকেই। অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় 'backward classes' বা অনগ্রসর সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এরাও নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সংরক্ষণ রাজনীতির পথে হাঁটতে শুরু করলে জাতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক পল ব্রাস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "Among both elite and middle status caste as process of caste succession had begun before Independence and was intensified after it with the adoption of adult franchise by which, in election after election, new leaders from previously unrepresented or underrepresented castes began to emerge and the castes

Scanned with CamScanner

themselves to be mobilized." স্বাধীনতার পর নতুন সচলতাযুক্ত জাতসমূহ 'কংগ্রেস ব্যবস্থা'তে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। আর অন্য অংশটি বিরোধী দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

অনেকগুলো নির্দিষ্ট কারণে আন্তঃজাতগত দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটেছিল। কতকগুলো রাজ্যে নেহরুর সময়ে অন্তর্বর্তী জাতগুলো ভোটাধিকার লাভ করে। অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করার ফলে, জমিদারি প্রথার বিলোপের ফলে রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ভারতের জনগণের এক-পঞ্চমাংশের বেশি তপশিলি জাতি ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনগণের শতকরা ১৪·২ ভাগ তপশিলি জাতি ও শতকরা ৬·৮ ভাগ উপজাতিভুক্ত। ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে জনগণের এক-তৃতীয়াংশ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বিশেষত রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বহু সংখ্যক জাতি ও উপজাতির সন্ধান মেলে। তুলনামূলকভাবে কেরল ও কাশ্মীরে উপজাতির সংখ্যা বিরল এবং সেখানে শতকরা ১০ ভাগের কম তপশিলিভুক্ত জাতি বসবাস করে। গান্ধিজি বর্ণিত "হরিজন" বা "ঈশ্বরের সন্তান" হল তপশিলি জাতি। এরা ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। মহারাষ্ট্রে "মাহার" সম্প্রদায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'রিপাবলিকান দল'টি হরিজন নেতা ড. বি. আর. আম্বেদকর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তপশিলি জাতিরা রাজনীতিগত দিক দিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে অত্যন্ত সক্রিয়। অন্যদিকে অসমে 'অল পার্টি হিল লিডার্স কনফারেন্স' তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল এবং পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে সেখানে মেঘালয় নামে 'স্বয়ং শাসিত' রাজ্য তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে তপশিলি ও উপজাতিদের বিশেষ সক্রিয়তা দেখা যায়। এছাড়া নাগাভূমি, উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল রাজ্যেই স্ব-স্ব উপজাতিগোষ্ঠী সেখানকার আঞ্চলিক রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয়।

নেহরু পরবর্তীকালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির সময়ে, ১৯৭১-এর নির্বাচন সম্পর্কে মরিস জোন্স (W. H. Moris Jones) তাঁর *"India Effects for Change and Stability"* গ্রন্থে বলেন, "Electoral support from these disadvantaged groups was of critical importance in Mrs. Gandhi's triumph in the 1971 elections" কিন্তু ১৯৭৭-এর নির্বাচনে অনগ্রসর শ্রেণি ও তপশিলি শ্রেণির সমর্থন না থাকায় শ্রীমতী গান্ধি পরাজিত হন। সুতরাং স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই সকল তথাকথিত নিম্নবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত।

ভারতের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব ঃ

ভারতের রাজনীতিতে জাত ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে কতকগুলো বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। এগুলি হল—(১) জাতভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা; (২) জাতভিত্তিক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার উদ্ভব; (৩) জাতগত উদ্বেগ ও দ্বন্দ্বসমূহ; (৪) জাতগত হিংসা; (৫) জাত এবং শাসক এলিট; (৬) জাত এবং গ্রাম্য রাজনীতি প্রভৃতি।

জাতভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অংশ জুড়ে। জাতভিত্তিক ফেডারেশন গড়ে তোলার প্রবণতাও বেশ স্পষ্ট। রুডলফ্ ও রুডলফ্-এর মতে, "by providing base for leadership and representation, the horizantal organizations of castes with common identities have conributed significantly to the success of political democracy." তামিলনাড়ুতে নায়ার সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'নাদার সঙ্গম'। আবার কেরলে 'নায়ার সার্ভিস সোসাইটি' অত্যন্ত সক্রিয় থাকে সরকার ভাঙা গড়ার ক্ষেত্রে। গুজরাটে 'ক্ষত্রিয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে, অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন এবং চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীসমূহ এই সভার সদস্য। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবীলাল আহীর, জাঠ, গুর্জর প্রভৃতি সম্প্রদায়কে নিয়ে AJGAR নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

Scanned with CamScanner

জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে জাতভিত্তিক দল বর্তমান ভারতে বিশেষ সক্রিয়। জাতিগত আবেগ অনুভূতি অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে জাতভিত্তিক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লোকদল, ডিএমকে, তেলেগুদেশম, অকালী দল, রিপাবলিকান পার্টি অব্ মহারাষ্ট্র, শিবসেনা। শ্রীরামবিলাস পাসোয়ান তপশিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে 'সাংবিধানিক অধিকার' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন সংরক্ষণ রাজনীতির মধ্য দিয়ে।

জাতিগত উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব ভারতীয় রাজনীতিতে একেবারে নতুন বিষয় নয়। রুডলফ্ ও রুডলফ্-এর মতে, "This is more than any other factor, accounts for the caste tensions and caste conflicts" স্বাধীনতার পর নতুন অবস্থায় যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পথ উন্মুক্ত হয় তার ওপর কর্তৃত্বের জন্য বিভিন্ন জাতের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যা পরবর্তীতে রূপ নেয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। যেমন, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন। তামিলনাড়ুতে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর ডিএমকে ভেঙে হয় এআইএডিএমকে। অন্ধ্রপ্রদেশে রেড্ডিও কাম্মা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। বিহারে যাদব ...ণায়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। উত্তরপ্রদেশে আবার দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সেখানকার রাজনৈতিক উত্তেজনার অন্যতম কারণ। সেখানকার দলিত নেত্রী মায়াবতী রাজ্য রাজনীতিতে একদিকে যেমন সক্রিয়, অন্যদিকে মুলায়াম সিং যাদবও যথেষ্ট প্রভাবশালী। সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও জাত- পাতগত বিবেচনা গুরুত্বলাভ করে। বিশেষ জাতের লোককে বিশেষ পদে আসীন করে সরকার গঠন করার রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে ভারতে। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরে মীরাকুমারকে স্পিকার করা হয়, তিনি তপশিলি জাতিভুক্ত। এখানে জাতপাতগত বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে বলে অনেকের অভিমত। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মতুয়া সম্প্রদায় এক বিশেষ জাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদের ভোট পাবার জন্য, এদের দাবি পূরণের জন্য সকল রাজনৈতিক দলই উঠে-পড়ে লেগেছে।

জাতভিত্তিক হিংসার দ্বারাও ভারতীয় রাজনীতি কলুষিত হয়েছে। গ্রামীণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টির সক্রিয়তা দেখা যায়। বিহারের বিজিতপুর, খাজুরিয়া এবং অন্য কিছু অংশে মজুরি শস্যের ভাগ, জমিতে চাষের অধিকারকে কেন্দ্র করে জাতভিত্তিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র অ-ব্রাহ্মণদের জাতপাতবিরোধী আন্দোলন বেশ জোরদার। জাতগত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।

জাতভিত্তিক শাসক এলিট মূলত বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য উচ্চ শ্রেণির হাতেই নিহিত। দলীয় রাজনীতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মূলত উঁচু শ্রেণিভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের কথা।

গ্রামীণ রাজনীতিতে বা স্থানীয় রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা নির্ণয় করা খুবই মুশকিল। তবে ভারতের শহরাঞ্চলের রাজনীতির তুলনায় গ্রামাঞ্চলের রাজনীতিতেই জাতপাতের প্রভাব বেশি। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার কম হয়েছে বলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বেশি। তাই জাতি দ্বন্দ্ব এখানে বর্তমান। নতুন নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটছে গ্রামাঞ্চলে। এরা জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে জায়গা করে নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

যাইহোক ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা রাজনীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের সময়ে মণ্ডল কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই কমিশনের সুপারিশক্রমে তপশিলি জাতি-উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু রাজনীতিতে নেতৃত্ব

Scanned with CamScanner

জাতপাতের বিষয়টি ব্যবহার করেন নিজেদের স্বার্থেই। অধ্যাপক রজনী কোঠারির মতে, "Politicians mobilise caste groupings and identities in order to organise their power."

ভারতের রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকাবিষয়ক আলোচনায় আরও কতকগুলি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এগুলিকে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ (ক) Andre Beteille মনে করেন ভারতে আঞ্চলিক ক্ষমতার মূল অংশ হল জমির মালিকানা। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিজীবী শ্রেণির রাজনীতিক প্রভাব বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে মারাঠা, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় জাঠ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে রেড্ডি ও কাম্মাদের প্রভাব বাড়ছে। (খ) ভারতে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে জাতিগত বিষয়টি প্রাধান্য পায়। নির্বাচন অনেক সময়ই দুটি জাতের লড়াইয়ে পরিণত হয়। যেমন—তামিলনাড়ুতে নাদার, থেবর, কর্ণাটকে লিঙ্গায়েত ও ওক্কালিঙ্গা, গুজরাটে পাতিদায় ও আন্নভাল ইত্যাদি। (গ) আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নীচুজাতের লোকেরা অনেক রাজ্যে সচেতনভাবে উচ্চজাতের বিশেষত ব্রাহ্মণদের বিরোধিতায় নেমেছে, যেমন তামিলনাড়ুতে। (ঘ) কোনো কোনো অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগণ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে। এটি একটি অভিনব বিষয়। যেমন—অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি সম্প্রদায় কংগ্রেস সমর্থক। আবার তামিলনাড়ুতে থেবর জাতি "ফরওয়ার্ড ব্লকে"র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে।

ভারতের রাজনীতিতে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া ক্ষমতা এখন আর নেই। ভারতীয় রাজনীতি কেন আজ তপশিলি জাতি-উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি আর উচ্চবর্ণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের এক জ্বলন্ত ক্ষেত্রে পরিণত হল, তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথা—যেখানে শূদ্র ছিল উপেক্ষিত ও অস্পৃশ্য। বর্তমানে এই সম্প্রদায় সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ প্রভাবশালী হওয়ায় উচ্চবর্ণের সঙ্গে চলছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ। (খ) উঁচু জাতির দুর্ব্যবহার ও সহনশীলতার অভাব—উঁচু বনাম নীচু সম্প্রদায়ের বিরোধের অন্যতম কারণ (গ) জাতিগত দাঙ্গা ও বিবাদ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহ ও রাজ্য সরকারগুলি উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে তা প্রায়শই সংঘটিত হয়। (ঙ) বর্তমানকালে গণমাধ্যমগুলির প্রচার ও প্রতিবেদনের ফলে আভ্যন্তরীণ জাতিদাঙ্গা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। (চ) নির্বাচনী রাজনীতি ও জাতপাতভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন জাতপাতের রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

পি. সাইনাথ তাঁর 'দলিত ভারত' গ্রন্থে বলেছেন, মনুস্মৃতি অনুযায়ী নীচু জাতের জীবন ছিল প্রায় মূল্যহীন। তাতে শূদ্র হত্যার অপরাধের মাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে—একটা ব্যাং, কুকুর, পেঁচা বা কাককে হত্যা করার সমতুল্য একজন শূদ্রকে হত্যা করার অপরাধ। স্বাধীন-নিরপেক্ষ ভারতীয় বিচার বিভাগের সঙ্গে রাজস্থানের সামাজিক বিধানের কোনো সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। কেননা এই রাজ্যে প্রতি ৬০ ঘণ্টায় একজন দলিত রমণী ধর্ষিতা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে খুন হচ্ছে একজন দলিত (পি. সাইনাথ, দলিত ভারত)। প্রতি পঞ্চম দিনে কোনো-না-কোনো দলিতের জীর্ণকুটির ভস্মীভূত করা হচ্ছে আগুন লাগিয়ে। দলিতদের বিরুদ্ধে করা উচ্চবর্ণের লোকদের এরূপ অপরাধের শাস্তি এ রাজ্যে বিরল ঘটনা। সুতরাং, যতই আইন হোক না কেন উচ্চজাত কর্তৃক নিম্নজাতের জনগোষ্ঠীকে শোষণ করার সামাজিক অনুশীলন এখনো বন্ধ হয়নি। এর ফলে দলিত সম্প্রদায়ের মনে বিক্ষোভ থাকলেও ভয় ভীততে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার তারা ভোগ করতে পারছে না। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও মেলামেশার ক্ষেত্রেও রয়েছে প্রতিবন্ধকতা। কারণ অস্পৃশ্যতা এক্ষেত্রে বড় বাধা। দলিতরা সবসময় ধর্মশালায় খালি থাকলেও ঘর পায় না। পি. সাইনাথ এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, "মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকারের বিতর্ক উঠলেই বিজেপি এবং কংগ্রেস সব বিভেদ ভুলে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। তেমন প্রতিটি ঘটনায় দলিতদের বিরুদ্ধে তীব্র সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য নিজেদের বাহিনীকে সশস্ত্র করে তোলে।"

সাংবিধানিক বিধি ও জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণ ঃ

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধানের বিধিনামা ও ধারাতে জাতপাত ও সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। প্রথমে ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয় তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিদের জন্য—সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় কাজের ক্ষেত্রে। এর উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক দিক দিয়ে অস্পৃশ্য এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। এই সংরক্ষণের বিষয়টি সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। আইনসভা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। ২০১০ সাল পর্যন্ত এই সংরক্ষণ কিন্তু রয়েই গিয়েছে। বরং বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংরক্ষণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনসমাজ মূলত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটি অংশ হল 'সংরক্ষণের সুবিধাভোগী' অংশ আর অপর অংশটি হল 'সংরক্ষণের আওতার বাইরে অবস্থিত জনসমাজের অংশ'। সংরক্ষণের সুবিধাভোগী শ্রেণি মনে করে যে এটা তাদের জন্মগত অধিকার, অনেকেই আবার মনে করে যে, এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার।

জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণের সমস্যা নিয়ে ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী মহলে বিভিন্ন ধরনের চর্চা চলছে বহুদিন ধরেই। ডাসকিন, গ্যালান্টার, করুণা আহমেদ, চিটনিস্ প্রমুখরা মনে করেন, আধুনিক ভারতের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা উচিত নয়। অন্যদিকে আন্দ্রে বেঁতে-র মতো অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, সংরক্ষণ প্রয়োজন। কারণ এর দ্বারা তপশিলি জাতি উপজাতিদের মূলধারার সঙ্গে একীকরণ করতে পারে। অনেকে আবার মনে করেন, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী সংরক্ষণের মাধ্যমে বিশেষত রাজনৈতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করে। গোপাল গুরু 'সংরক্ষণের রাজনীতি ঃ শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, উদারপন্থী, জাতীয়তাবাদী ও নব্য জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীগণ সংরক্ষণের শ্রেণি চরিত্র ও তার আর্থিক ভিত্তিকে নির্ণয় করতে পারেননি। মার্কসবাদী গবেষকগণ সংরক্ষণে শ্রেণি ও জাতপাত কোন্‌টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে, সে প্রসঙ্গে দ্বি-বিভক্ত। কিছু মার্কসবাদী গবেষক, সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করার পাশাপাশি জাতপাতের প্রথাও দূর করতে চান। আবার কিছু বামপন্থী তাত্ত্বিক শ্রেণির আলোকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কিছু আপত্তিকর দিক আছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে যদিও পুঁজিপতি শ্রেণি শাসন করে তথাপিও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের স্বার্থে সংরক্ষণ জরুরি। সিপিআই (এম) নেতা বি. টি. রণদিভে তাঁর *'Class and Property Relations'* গ্রন্থে বলেন, জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণের নীতি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অন্তঃবিরোধ সৃষ্টি করে এবং নিপীড়িত শ্রেণি হিসেবে তাদের একতা বিনষ্ট করে।

কার্ল মার্কস জাতপ্রথাকে ভারতের শক্তি ও প্রগতির পথে নির্ধারক বাধা হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মার্কসবাদীগণ জাতকে উপরি কাঠামো বলেই গণ্য করেছেন। জাত হল একটি উৎপাদন সম্পর্ক। সুতরাং, তা উপরি কাঠামোর ব্যাপার নয় বরং এটি আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই অঙ্গ। কিন্তু ভারতীয় মার্কসবাদীগণ জাতকে সমাজের মূল কাঠামোর বিষয়রূপে গণ্য করতে অস্বীকার করেছেন। শ্রেণি হল বুনিয়াদী বর্গ। কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জাতরূপেই তা অভিব্যক্ত হতে পারে, আবার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিশেষে এই দুই বর্গ এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, তারা পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যায় ও পরস্পরকে ছেদ করে। বিনোদ মিশ্র 'জাত, শ্রেণি ও দলিত ঃ একটি বিশ্লেষণ—প্রয়াস' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, জাতগুলি ভেঙ্গে গিয়ে শ্রেণিরূপে দানা বাঁধতে পারে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিতে। আবার পরস্পর, জড়িয়ে থাকতে পারে কিংবা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। এইভাবে বৈপরীত্য চলতে থাকে।

Scanned with CamScanner

জাতপাত বনাম শ্রেণি-র সম্পর্ককে বামপন্থীরা মূলত যেভাবে দেখেন, তাহল—ভারতে যদি সংরক্ষণকে টিকিয়ে রাখতেই হয় তাহলে জাতপাতের পরিবর্তে শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্যবস্থাটিকে দেখা উচিত। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, যতদিন পর্যন্ত ভারতে বর্তমান পুঁজিবাদী বুর্জোয়ার জমিদারভিত্তিক শাসনব্যবস্থা টিকে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণকে জাতপাতের ভিত্তিতেই করতে হবে। কিন্তু জাতপাত কেন্দ্রিক বিবেচনা থেকে না দেখে বিষয়টিকে শ্রেণিগত বিবেচনা থেকে দেখা উচিত। অর্থাৎ, যারা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে, তাদেরই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমতা ও সামাজিক ন্যায় প্রাপ্তিতে সাহায্য করা উচিত। মার্কসবাদীগণ মনে করেন, জাতপাতের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতেই সংরক্ষণকে দেখা উচিত। অর্থাৎ জাত নয়, শ্রেণিই হোক সংরক্ষণের মানদণ্ড।

এমন একটা সময় ছিল যখন ব্রাহ্মণরা জাতপাত ও শ্রেণি উভয় বিচারেই শ্রেষ্ঠ ছিল। তখন জাত ও শ্রেণি উভয়ের নিরিখে সাধারণত সমাজের উঁচু বর্ণের মানুষরাই ছিল ক্ষমতাবান। কিন্তু স্বাধীনতার পরে সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে ও ভূমিসংস্কার আইন বাস্তবায়নের ফলে তপশিলি জাতপাতভুক্ত মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশালী রয়েছে। ফলে সংরক্ষণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ জুড়ে ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণি লাভবান হয়েছে। গ্রামীণ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেণিগত উঁচু স্থানের অনেক জায়গায়ই স্থলন হয়েছে। কোথাও দলিত রাজনীতির দাপটে ব্রাহ্মণদের দলিতায়ন ঘটেছে। মজার ব্যাপার হল এই যে, সংরক্ষণের সুবিধাভুক্ত তপশিলি জাতপাতভুক্ত মানুষদের মধ্যেই এক নতুন আন্তঃশ্রেণিগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। গোপাল গুরু মনে করেন, সংরক্ষণের সুবিধাভোগী উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকগণও তাদের নিজ গোষ্ঠীর লোকদের সাহায্য করতে অসুবিধা ভোগ করেন। অনেক সময়ই শাসকশ্রেণি হিসেবে তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যকার পিছিয়ে পড়া অংশকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি মনে করেন, এই মালিক—খদ্দের অবশ্যম্ভাবেই সংরক্ষণের বিপ্লবাত্মক ভাবধারাকে শিথিল করে দেয়। জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক—এ দুটি দিকই রয়েছে। সংরক্ষণের ফলে একদিকে সংরক্ষণের সুবিধাভোগী একধরনের ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সংরক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে একধরনের শিক্ষিত বেকার দেখা যায়। এর ফলে তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে বেকারদের মনে একধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যা থেকে জাতপাত কেন্দ্রিক শ্রেণি সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, ভারতের নিরিখে জাতপাত ও শ্রেণির সম্পর্কে অত্যন্ত জটিল এবং এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমানা টেনে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়।

ভারতীয় সংবিধানে 'Backward Class' (পিছিয়ে পড়া শ্রেণি) সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু তপশিলি জাতি ও উপজাতিকে একত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে গণ্য করলেও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই।

'পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের' (৩৪০ নং ধারা) অবস্থান জানার জন্য ১৯৫৩ সালে কাকা সাহেব কালেলকর (Kalel Kar)-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশেস কমিশন তাদের রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট জমা দেয়। এরপর রাজ্য সরকারগুলিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য তালিকা তৈরি করতে।

দ্বিতীয় পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের জন্য কমিশন (Backward Classes Commission) ১৯৭৮ সালে বি. পি. মণ্ডলের নেতৃত্বে জনতা সরকারের সময়ে গঠিত হয়। কমিশনের মতানুযায়ী অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হল মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২৭ শতাংশ আসন OBC-দের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে। কারণ সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই OBC-দের উন্নয়ন সম্ভব। বালাজি বনাম মহিশূর মামলায় (১৯৬৩) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণ কখনোই ৫০ শতাংশ অতিক্রম করা যাবে না। কমিশন পুনরায় সুপারিশ

Scanned with CamScanner

করেছিল ১৫ শতাংশ তপশিলি জাতিদের জন্য ৭·৫ শতাংশ তপশিলি উপজাতিদের জন্য এবং ২৭ শতাংশ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিদের (OBC) জন্য অর্থাৎ, ৪৯·৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা হোক। ভি. পি. সিং ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রী হন এবং এই কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতপাতভিত্তিক দাঙ্গা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ২০০৬ সালে ইউপিএ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী OBC-দের জন্য ২৭ শতাংশ আসন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করলে দেশ জুড়ে বিশেষত দিল্লি ও কলকাতায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট ২০০৭ সালের এক রায়ে এই সংরক্ষণের বিষয়টির ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ মেনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অনগ্রসর (OBC) তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে। সুতরাং, দীর্ঘদিন ধরে জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণে কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা থাকত; এখন থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাও ঢুকল, ফলে সংরক্ষণের মাত্রা একদিকে যেমন বাড়ল অন্যদিকে তেমনি আরও কিছু সম্প্রদায়ে সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হবার দাবি আরও জোরালো হল।

জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণ ঃ একটি দীর্ঘকালীন বিতর্ক ঃ

'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য' (Protective Discrimination) জাতপাতভিত্তিক বিতর্ককে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারায় সাম্যের অধিকার সম্পর্কিত যে বক্তব্য রয়েছে, তা তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ব্যতিক্রমী হিসেবে নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণ করার ফলে বিঘ্নিত হয়েছে কিনা—এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনগ্রসর জাতপাতভুক্ত সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির জন্য সাংবিধানিকভাবে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার ফলে একধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, একেই বলা হয় 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য'। ২০০৬ সালের ২৭ নভেম্বর সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা সংরক্ষণ, বিতর্ক নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। আম্বেদকর একবার মন্তব্য করেছিলেন, হরিজনদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধি অনশন করেন না, কিন্তু এদের জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষণ হলে সংরক্ষণ করেন (সুজিত সেন সম্পাদিত, পৃ. ১৪)। সংরক্ষণের অভীষ্ট লক্ষ্য হল আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের জনগণের ক্ষমতায়ন। কিন্তু বিতর্ক যেখানে দানা বেঁধেছে তা হল—আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের জনগণের মধ্যে তো উচ্চবর্ণের মানুষজনও রয়েছে। তারাও প্রথম থেকেই দলিতদের মতো জীবনযাপন করছে বা এখন করছে। তাহলে এই উচ্চবর্ণের অথচ আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার লোকদের কী হবে? বিতর্ক আরেকটি জায়গায় বেশ জোরালো হয়েছে যে, তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্তদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন ধরেই আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সমাজের ক্রিমি লেয়ারে রয়েছেন তারাও কেন সংরক্ষণের সুবিধে ভোগ করবে? তাহলে বিষয়টি তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতই দাঁড়ায়। জাতপাতভিত্তিক রাজনৈতিক সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য, কিংবা ভোট রাজনীতির সমীকরণের বিবেচনায় সর্বভারতীয় পর্যায়ভুক্ত কোনো রাজনৈতিক দলই এইপ্রকার সংরক্ষণের বিরোধিতায় যায় না। যাইহোক, প্রথমে ভারতীয় সংবিধানে ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। এরপর সংরক্ষণের সীমা তুলে দেওয়ার পরিবর্তে ১০ বছর ধরে তার সীমানা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু যুক্তিবাদীগণ মনে করেন সংরক্ষণ যদি রাখতেই হয় তাহলে জাতপাতের নিরিখে নয়, বরং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তা নির্ণয় করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই সামাজিক অনগ্রসরতা। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প ও বিকল্প কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করতে হবে। উঁচু চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে কাজের মান ঠিক থাকবে কিনা এনিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সংরক্ষণের আওতাভুক্ত অথচ শিক্ষা ও আর্থিক মানদণ্ডের বিচারে অগ্রসর এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদেরকে সংরক্ষণের আওতাভুক্ত ভাবতে রাজি নন।

Scanned with CamScanner

প্রাক্ স্বাধীন ভারতেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩১ সালে মাদ্রাজে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম সংরক্ষণ চালু করেছিল। এর পরে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, মহিশূর রাজ্যে উনিশ শতকে এবং ১৯০২ সালে কোলাপুর রাজ্যে নিম্নবর্গ মানুষদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তারপরে প্রায় ১০০ বছর ধরে ভারতে সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্ক চলছেই। স্বাধীনতার পর সংরক্ষণ চালু রয়েছে। বহু সরকারি পদ তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। এই পদগুলিতে প্রার্থী না পাওয়ায় স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদ খালি পড়ে থাকে, বঞ্চিত হচ্ছে সংরক্ষণের দ্বারা প্রকৃত অনগ্রসর শ্রেণি। যথা, অনাহারে থাকা শ্রমিক-চাষি, মুচি, মেথর কিংবা অন্তজ-হরিজনদের সত্যিই কী উপকার হয়েছে? অনেকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন তপশিলি জাতি-উপজাতিদের মধ্যে যারা বাছাই করা (elite) তারাই এই সুবিধা ভোগ করছে। এটা ঠিক যে প্রাচীন ভারতের বৈদিক যুগ কিংবা উপনিষদের বর্ণনা থেকে হিন্দু সমাজের যে চতুর্বর্ণ-র স্তর বিন্যাস পাওয়া যায়, তাতে এটা স্পষ্ট যে উঁচু জাতের দ্বারা নীচু জাতের মানুষ নির্মমভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছে। সেই দীর্ঘকালীন অত্যাচার এখনও চলছে। তাই ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টও বিষয়টিকে দীর্ঘকালীন বঞ্চনাজনিত ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংরক্ষণ বজায় রাখার পক্ষেই বক্তব্য রেখেছে। জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণের জন্য জাতপাতভিত্তিক বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের সুবিধাপ্রাপ্ত বনাম সুবিধা থেকে বঞ্চিত—এই দুই-এর মধ্যে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার-এর মতে, "The ends of reservation is the ending of reservation. To lend immortality to reservation policy is to defeat its raison d'ctre."

জাতপাত ভিত্তি সংরক্ষণের **ইতিবাচক** ও **নেতিবাচক** উভয়দিকই রয়েছে। প্রথমেই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও **ইতিবাচক দিক** নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। **প্রথমত**, অনগ্রসর, অচ্ছ্যুৎ, অস্পৃশ্য ও দলিত মানুষদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এরফলে কিছু সুবিধা পেয়ে তারা সমাজজীবনের মূল স্রোতে মিশতে পারে। এতদিনের সরকার ও জমিদারতন্ত্র বিরোধী ক্ষোভ ভুলে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ভারতের অংশীদার ভাবতে পারে। সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক সমবন্টন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় বলে সামাজিক অসন্তোষ কমে, অপরাধ কমে ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। **দ্বিতীয়ত**, উঁচু জাতি কর্তৃক নীচু জাতির প্রতি দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। **তৃতীয়ত**, দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও সামাজিক অপরাধ বন্ধ করার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। কারণ সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় একটি অংশের জনগণের মধ্যে। **চতুর্থত**, রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক কাঠামোর সচলতা, রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন করার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। জাতীয় সংহতিকে বজায় রাখার জন্যও সংরক্ষণ প্রয়োজন কারণ, এর ফলে পিছিয়ে পড়া জাতির প্রতিষ্ঠান ও সরকারের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। **পঞ্চমত**, ভারতের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুসংহত ও বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য। সামাজিক ন্যায়ের তাত্ত্বিক কাঠামোকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন।

সংরক্ষণের **নেতিবাচক দিক** আলোচনা করতে গিয়ে **প্রথমত**, যে বিষয়টি উঠে আসে সেটি হল সংরক্ষণের আওতায় থাকা অনগ্রসর মানুষদের সমাজ অনেক সময়ই করুণা ও অবতার চোখে দেখে। **দ্বিতীয়ত**, সংরক্ষণের ফলে সমাজে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। কারণ অনেকেই মনে করেন, এতে মেধার পরিবর্তে পাইয়ে দেওয়ার নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। **তৃতীয়ত**, ক্রমাগত সংরক্ষণ পাওয়ার ফলে তপশিলি জাতি উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের যুব প্রজন্ম ভেবেই নিচ্ছে যে, সংরক্ষণের দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধাগুলি তাদের মৌলিক অধিকারের মতই। অর্থাৎ, তারা ভেবে নিচ্ছে সংরক্ষণ তাদের জন্মগত অধিকার। এটা ঠিক নয়। কারণ তাহলে কোনোদিনই সংরক্ষণ তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। **চতুর্থত**, সংরক্ষণ অল্প কিছু

Scanned with CamScanner

সময়ের জন্য চালু থাকলেও বেশি দিনের জন্য এটি টিকিয়ে রাখা উচিত নয়। এতে সামাজিক
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লঙ্ঘিত হতে পারে। **পঞ্চমত,** সংরক্ষণের উপস্থিতি দীর্ঘদিন যাবৎ চলে
থাকলে জাতপাতগত এমনকি সামাজিক সচলতাগত ব্যবধান এবং সংস্কৃতিগত ব্যবধান দেখা দিতে পারে
ষষ্ঠত, সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে নিম্ন জাতপাত ভুক্ত এক শ্রেণির মানুষ যারা পূর্বে থেকেই ধনী ছিল
আরও ধনী হয়ে যাচ্ছে ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে 'নিম্ন বর্গের এলিট' রূপে প্রভাব বিস্তার করছে
সংরক্ষণের দ্বারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ উপকৃত হচ্ছে না। **সপ্তমত,** সংরক্ষ
ব্যবস্থা জাতপাতভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন ও ভোট ব্যাংক কেন্দ্রীক হয়ে পড়ায় ভারতের রাজনীতিতে
নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে, যা ভারতের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের সামনে
দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় জাতের বিচারে সংরক্ষণের বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন। 'এই গেল গেল, র
নতুন নয়' নামক প্রবন্ধে। তাঁর মতে, যোগ্যতার বিচার না করে সরকারি চাকরি প্রার্থীদের একাংশের জন
পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সুতরাং, এ বিষয়টিকে তিনি বৈষম্যমূলক ও প্রশাসনিক কাঠামোর পক্ষে
ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন জাতপাতের বিচারে যারা উঁচু তারাই যে কেবল
সুবিধাভোগী ও নীচু জাতভুক্ত সকলেই বঞ্চিত ও নিপীড়িত এ কথা সঠিক নয়। জাতপাতভিত্তিক
সংরক্ষণের ফলে তাঁর মতে, নীচু জাতের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সম্পন্ন তারাই লাভবান হবেন
প্রকৃত সংরক্ষণমূলক সুবিধা যাদের দরকার তারা পাবেন না। সংরক্ষণ যদি করতেই হয় তাহলে
জাতপাতের বিবেচনার ভিত্তিতে না করে তা আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতেই করা সঙ্গত। জাতপাতভিত্তিক
সংরক্ষণকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবেই দেখেছেন। জাতপাতগত বৈষম্য
ও বিবাদ দূর করার জন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ। কিন্তু তা না করে
কেবলমাত্র চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করলে বৈষম্য আরও বাড়বে, কমবে না।

জাতপাতের রাজনীতি ঃ উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহার ঃ

ভারতের সমাজ স্বাধীনতার পর অস্পৃশ্যতা থেকে সাংবিধানিক আইনগত ভীতিতে কিছুটা সরে
এসেছে বটে কিন্তু জাতপাতগত ক্ষমতার লড়াই, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক সচলতার বিষয়টিতে
প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গেছে। ভারতের জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থায় রাজনীতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়।
উত্তরপ্রদেশের দলিত রাজনীতি অত্যন্ত প্রভাবশালী। সেখানে বহুজন সমাজবাদী পার্টির স্রষ্টা কাঁসিরাম
দলিত সম্প্রদায়ের রাজনীতিকরণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যা শ্রীমতি মায়াবতীও প্রথমে দলিত ভোট ব্যাংক
বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছিলেন, কিন্তু ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল
ভোটে জয়ী হন মায়াবতী। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের অনেক প্রার্থীই কিন্তু ছিলেন মুসলিম এবং
উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাহলে এই ঘটনাকে ব্রাহ্মণের দলিতায়ন বলে অনেকে মনে করেছেন।

তবে মণ্ডলায়নের ফলে উত্তর আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণসহ উচ্চ বর্ণীয়রা অনেকটাই কোণঠাসা। সেখানে
ক্রমেই দাপট বাড়ছে OBC-র। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের OBC-রাজ ইতিমধ্যেই কায়েম হয়েছে। গোটা
উত্তর ভারতেই পুলিশে, আমলাতন্ত্রে, গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থে, শহরে পুঁজি সম্পদে OBC প্রাধান্য বর্ধমান।
এর কাছে আত্মসমর্পণ করে বর্ণ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শংকর সিং বাঘেলা ও কল্যাণ সিংহের মতো OBC
নেতাদের সামনের সারিতে তুলে আনার 'সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং' চালিয়েছে, শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণদের নিজস্ব কোনো সংগঠন নেই। দল হিসেবে তারা মায়াবতীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে
না বা আসন নিয়ে দর কষাকষি করছে না। তারা ভোটে দাঁড়িয়েছে, ভোট দিয়েছে—মায়াবতীর দলিত
সংগঠনের প্রার্থী হিসেবেই। যদিও ক্ষমতা লাভের প্রয়াসে ব্রাহ্মণদের দলিতায়ন প্রক্রিয়া ঘটেছে, তথাপিও
জাতপাত কেন্দ্রিক হিংসাশ্রয়ী ভারতীয় রাজনীতিতে এটি সম্প্রীতির নিদর্শনই ধরা যায়।

Scanned with CamScanner

অন্যদিকে ২০০৭ সালের মে মাসে পাঞ্জাবে জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতায় পাঞ্জাবে জারি হয় ১৪৪ ধারা। সেখানে 'ডেরা সাচা সৌদা' নিজেকে একটি ধর্মীয় সংগঠন বলে গণ্য করে। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। সদস্যদের মধ্যে শিখরাও আছেন, যেমন আছেন নানা ধর্মের মানুষ। কিন্তু নিম্নবর্গের দলিত শিখরাই এর প্রাণ, অকালি রাজনীতিতে কিংবা গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির কাছে যারা বিশেষ গুরুত্ব পান না। হরিয়ানার সিরসায় এই সংগঠনের সদর দপ্তর। পাঞ্জাবের বিশেষত ভাতিণ্ডা ও পাতিয়ালা জেলায় এর প্রভাব যথেষ্ট। গত বিধানসভা নির্বাচনে 'ডেরা' কংগ্রেসকে সমর্থন করায় রাজ্যের জেতা ৬৫টি আসনের মধ্যে এই অঞ্চল হতেই কংগ্রেস পায় ৩৭টি আসন। অকালিশাসিত পাঞ্জাবে শিখ আর ডেরার বিরোধ অনেকাংশেই জাতপাত কিংবা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অশুভ ইঙ্গিত প্রদান করছে।

বিহারে জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি চরম পর্যায়ে উপস্থিত। সেখানে উচ্চবর্গীয় জাত এবং নিম্নবর্গীয় জাতের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। জাতভিত্তিক রাজনীতির হাত ধরে নেতৃবর্গ প্রশাসনিক ক্ষমতাকে যেমন নিজের মতো করে ব্যবহার করেন আবার জাতভিত্তিক ক্যাডারবাহিনী পোষণ করেন, যারা সশস্ত্র। জাতের রাজনীতির মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বিহারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ী দেবী, নিজের নামে একটি হল্ট স্টেশন স্থাপন করেছিলেন। হল্ট স্টেশন হয়েছিল লালুপ্রসাদ যাদবের সময়েও। বিহারের আরও এক প্রাক্তন রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের নামেও হল্ট স্টেশন ছিল। কিন্তু এটি শেষপর্যন্ত বৈধতা পায়নি। বিহারে জাতপাতের রাজনীতি করতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের নামে তৈরি হল্ট স্টেশনের উদ্বোধন করতে গিয়েছেন, এমন নজির বিরল নয়।

বিহারের বক্সারের কাছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামানন্দ তেওয়ারির নামেও হল্ট স্টেশন ছিল। আবার বিহারের ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকায় নিজের ভোট ব্যাংককে ধরে রাখতে শিবানন্দ তেওয়ারি বারা নামে হল্ট তৈরি করেছিলেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে তুষ্ট রাখতে অবশ্য সেই হল্টকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে লালুর রেল বোর্ড। সুতরাং, বিহারের জাতপাতের রাজনীতি ভোটব্যাংক ঘিরেই আবর্তিত হয় বলা যায়।

তবে ২০১০-এর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের রায় বের হবার পরে বিশেষজ্ঞ মহলে এ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, বিহারে কী জাতপাতের রাজনীতির প্রভাব অস্তমিত হল? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, একথা কিছুটা অবশ্যই সত্যি। কারণ লালুপ্রসাদ যাদবের জাতপাত বনাম নীতিশকুমারের উন্নয়নের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ভোট পড়েছে বিপুল ভাবে নীতিশকুমারের পক্ষেই। তাই বিহারের জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা নতুনভাবে শুরু করা যেতে পারে।

তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে জাতপাত ঃ তামিলনাড়ুর রাজ্য রাজনীতিতে জাতপাতের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বনাম অ-ব্রাহ্মণ ইস্যু হল তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ সালে যখন অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে Justice Party গঠিত হয়েছিল, তখন থেকেই ব্রাহ্মণতন্ত্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য-রাজনীতির ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে ব্রাহ্মণদের অপসারণ করা। ব্রাহ্মণ বিরোধী গোষ্ঠী থেকে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল অ-ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য। জাতপাত ইস্যুকে কেন্দ্র করে DMK গঠিত হয়েছিল। যা থেকে পরবর্তিতে AIADMK সৃষ্টি হয়েছিল। মরিস জোন্স-এর মতে, "...non Brahmins has not merely dominated the whole shape of Madras (Tamil Nadu) Politics, but has in particular made a significant contribution to the movement for Dravidian separatism now expressed by the Dravid Munnetra Kazgham."

অন্ধ্রপ্রদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও জাতের ভূমিকা যথেষ্ট। অন্ধ্রপ্রদেশে জাতীয়, আঞ্চলিক এমনকি কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলোও জাতপাতের সূত্রকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাথায় রাখে।

Scanned with CamScanner

অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচনী রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে জাতভিত্তিক। রেড্ডি, কাম্মা ও ভালামস এই তিন জাতের জন্য এই রাজ্যের রাজনীতি ক্ষমতাগত প্রতিযোগিয় ত্রিভুজ আকৃতির। অন্ধ্রপ্রদেশের দল ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল রেড্ডি ও কাম্মাদের মধ্যে। একটি সময়ে কাম্মা সম্প্রদায় 'কাম্মা রাষ্ট্র' এবং রেড্ডি সম্প্রদায় 'রেড্ডি সীমা' গঠনের জন্য পৃথক দাবী জানিয়ে ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের যে প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সেটাও মূলত জাতপাতের বিবেচনাপ্রসূত। অধ্যাপক শ্রীনিবাস-এর মতে, "The regional claims in Andhra and often only a disguise for caste claims."

কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে জাতপাত ঃ কর্ণাটকের রাজ্য রাজনীতিতে জাতপাতের গভীর শিকড় লুকিয়ে রয়েছে। প্রধান যুযুধান দুটি জাত হল লিঙ্গায়েত ও ওক্কালিঙ্গা। লিঙ্গায়েত দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কেবলমাত্র ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ওক্কালিঙ্গা জাতভুক্ত গোষ্ঠীরা ক্ষমতায় ছিল, বাকী সময়ে লিঙ্গায়েতগণই আধিপত্য বিস্তার করেছে।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে মারাঠা, ব্রাহ্মণ, মাহার—এই তিন জাত রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। সংখ্যাগত দিক থেকে ব্রাহ্মণরা স্বল্প হলেও এরা উচ্চশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং রাজ্য রাজনীতিতে বেশ প্রভাবশালী। মাহার সম্প্রদায় জনসংখ্যার বিচারে গরিষ্ঠ। কংগ্রেস দল এই সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘদিন ধারাবাহিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। ১৯৯০ সালে এই সম্প্রদায়ের সমর্থনে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। মারাঠাগণ জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। খোলাপুর ও সাঁতারা এলাকাতে এরা সপ্রবেশিত। এদের সংগঠন হল শিবসেনা। নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্তমানে বালঠাক্‌রে। উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও মারাঠা জাতীয়তাবাদ এর প্রচার ও অ-মারাঠাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করা এই রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতপাতের রাজনীতি, সংরক্ষণ বিষয়ক সংঘর্ষ ও উত্তপ্ত রাজস্থান ঃ

জাতপাতভিত্তিক ভারতীয় রাজনীতি যেমন উত্তপ্ত ও বহুধা বিভক্ত সেখানে সংরক্ষণ প্রশ্নে সংঘর্ষ জাতির কলঙ্ক ছাড়া আর কী? বিশ্বের কোনো দেশেই জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। অথচ ২০০৭ সালের ২৯ মে সংরক্ষণ চেয়ে বিক্ষোভ এবং ফলশ্রুতিতে রাজস্থানে নিহত হয় ১৪ জন ও আহত হয় ৩০ জন। বিধানসভা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ক্ষমতা আসার পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। আরও একবার বেরিয়ে এল জাতপাত ও সংরক্ষণের রাজনীতির নগ্ন ও নির্লজ্জ চেহারা। রাজস্থানের দৌসা, বুঁদি আর করৌলি জেলার গুর্জর সম্প্রদায়ের লোকেরা OBC থেকে তপশিলি জাতির পরিচয় পাওয়ার দাবিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রাজস্থানে বিজেপি শাসনাধীন বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রের কাছে গুর্জর সম্প্রদায়ের বিষয়টি সুপারিশ করবে। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও এই সম্প্রদায়ের দাবি রাখা হয়নি। অথচ এ অঞ্চলের বাসিন্দা জাঠ ও মিনাদের লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। জাঠরা OBC-তে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। অথচ গুর্জরদের কিছুই হয়নি—এটাই অস্বস্তির বড়ো কারণ। ফলে জাতপাত ও সংরক্ষণভিত্তিক সংঘর্ষের ঘটনাই ঘটে যা আরও একবার ভারতের রাজনীতিকে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

সংরক্ষণ বিষয়টি এতই স্পর্শকতার যে এই বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা সমাধান সূত্র মেলেনি বেসরকারি এবং কোনো পর্যায়ের সদিচ্ছা দেখা যায়নি। সংরক্ষণের প্রশ্নে 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য নীতি' ততক্ষণ পর্যন্তই মানা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় উন্নতির পাদপ্রদীপে আসার

Scanned with CamScanner